ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2354-2365
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.497

প্রকৃতি, প্রযুক্তি ও মানবসত্তা: মঈনুল আহসান সাবেরের *সীমাবদ্ধ* গল্পগ্রন্থের পরিবেশগত পাঠ

মোহাম্মদ অবেদুল্লাহ, *প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ*

Received: 05.07.2026; Accepted: 22.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The world of Bengali short stories is enriched by diverse themes spanning social structures, psychological conflicts, urban existence and nature. Moinul Ahsan Saber, a prominent fiction writer of post-independence Bangladesh, skillfully explores the complexities of urban life, social dynamics and the human mind. His *Seemabaddha* (Bounded) series of short stories presents a nuanced psychological analysis of characters navigating the stark contrast between mechanical city life and natural environments. This research employs an ecocritical lens to examine how environmental settings dictate behavioral, emotional and psychological shifts in Saber's characters. The study highlights how the harshness, commercialization and technology-driven routines of urban space induce apathy, isolation, self-centeredness and violent impulses. Conversely, when these characters temporarily escape into natural settings- such as forests, rivers, and mountains; nature acts as a therapeutic catalyst that unburdens them of social inhibitions, restores lost empathy and revitalizes their core humanity. By analyzing stories like *Seemabaddha (1-3)*, *Prakritik*, *Gras*, and *Hontarak*, this paper demonstrates how Saber portrays nature not merely as a scenic backdrop, but as a moral, psychological and aesthetic counterweight to the alienating nature of modern mechanization. Ultimately, the paper analyzes the inevitable tragedy of modern existence: despite experiencing spiritual rejuvenation within nature, individuals remain bound to return to their structured, controlled and mechanical urban realities.

Keywords: Nature, Urban Life, Psychology, Mechanization, Technology, Ecocriticism

১

ছোটগল্প হলো জীবনের কোনো একটি মুহূর্তের চিত্র বা বিবরণের শিল্পিত উপস্থাপন। একজন গল্পকার বিচিত্র ও বহুমাত্রিক চরিত্রের মাধ্যমে সঠিক পরিবেশ ও সংলাপের সাহায্যে গল্পকে জীবন্ত করে তোলেন। সাহিত্য সবসময় সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কারণ একজন লেখক মূলত তাঁর সময়ের প্রতিনিধি, যিনি নিজের যুগের সমস্যা ও সংস্কারকে তুলে ধরেন। তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে সমকালীন সমাজের

প্রভাব, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। তবে এগুলোর বাইরেও একজন লেখকের রচনায় নতুন যুগের সম্ভাবনার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

পঞ্চাশের দশক থেকেই বাংলাদেশের ছোটগল্পে পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়। ষাটের দশকে এসে তরুণ গল্পকাররা ছোটগল্পে নিরীক্ষাপ্রবণ হয়ে ওঠেন। এই সময় সাহিত্যে নতুনত্ব আসে- বিষয় নির্বাচনে, প্রকাশভঙ্গিতে, এমনকি চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রেও। এ সময়ের ছোটগল্প জাতিসত্তার শিকড় অনুসন্ধানে মৃত্তিকাস্পর্শী হয়ে ওঠে। গল্পের বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের পাশাপাশি ভাষারীতিতেও চলে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রেক্ষাপটে এ সময়ের গল্পগুলো ফুটিয়ে তোলে ষাটের উত্তাল বাংলাদেশের বাস্তবচিত্র। একই সঙ্গে এ গল্পগুলো দেশের সংগ্রামী ও সংক্ষুব্ধ মানুষের মনোভাবও উজ্জীবিত করেছে। সত্তরের দশকে এসে গল্পে দেখা যায় হতাশা কাটিয়ে ওঠার চিত্র। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল অর্থনীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দ্রুত নগরায়ণ এবং গ্রাম থেকে শহরের দিকে মানুষের স্রোত সমাজব্যবস্থায় যেমন প্রভাব ফেলেছে, তেমনি এসব বিষয় গল্পে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য গল্পকারদের মধ্যে আছেন হরিপদ দত্ত (১৯৪৭), বুলবুল চৌধুরী (১৯৪৮-২০২১), হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২), জাফর তালুকদার (১৯৫২), মুস্তাফা পান্না (১৯৫২), আতা সরকার (১৯৫২), মঞ্জু সরকার (১৯৫৩), আবু সাঈদ জুবেরী (১৯৫৪), ইমদাদুল হক মিলন (১৯৫৫) এবং মঈনুল আহসান সাবের (১৯৫৮)।

বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার পুরো পৃথিবীর চেহারা পাল্টে দেয়। পুঁজি, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় আসে বড় পরিবর্তন। এর প্রভাব পড়ে সমাজ, সংস্কৃতি এবং জীবনধারায়। পুঁজিপতিরা শিল্পকারখানায় বিনিয়োগ শুরু করেন, আর শ্রমিক শ্রেণি পেশা বদলের প্রবল আকর্ষণে মেতে ওঠে। গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে রাজধানী ও বড় বড় শহরগুলো হয়ে ওঠে চমকপ্রদ এবং লোভনীয়। এ পরিবর্তন কবিদের জন্য নতুন কবিতার উপকরণ, গল্পকারদের জন্য নতুন প্লট, গীতিকারদের জন্য নতুন আবেগ এবং গায়কদের জন্য নতুন সুর এনে দেয়। গানের কথায় কথায় ধরা পড়ে এই আবেগ: "ঢাকা শহর আইসা আমার আশা ফুরাইছে/লাল নীল লাল নীল বাত্তি দেইখা নয়ন জুড়াইছে।" কিন্তু যখন শহরে আটকা পড়া মানুষগুলো পুঁজিবাদের কঠিন বাস্তবতা বুঝতে পারে, ততক্ষণে তাদের জীবন চিরতরে ট্র্যাফিক জ্যামের মতো স্থবির হয়ে যায়। স্বপ্নভঙ্গ হওয়া মানুষগুলোর আর ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় থাকে না। তাই গ্রাম ও প্রকৃতি তাদের কাছে হয়ে ওঠে আরাধ্য। সুযোগ পেলেই তারা ছুটে যায় প্রকৃতির সান্নিধ্যে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস একবার বলেছিলেন, "ছোটগল্প তো তাঁর জন্মলগ্ন থেকেই বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির রোগ ও ক্ষয়কে তীক্ষ্ণভাবে নির্ণয় করে আসছে।"[১] শহুরে কর্পোরেট জীবনের একঘেয়েমি, কর্মব্যস্ততার চাপ, যোগাযোগহীন কংক্রিটের ফ্ল্যাটে বসবাস, নাগরিক হতাশা ও বিষণ্নতা, একাকিত্ব এবং ইট-পাথরের ঘেরা জীবনের গল্প লেখকরা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তাদের লেখায় তুলে ধরেছেন।

নগরায়নের ঢেউ আজ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলো যেন আকাশ ভেদ করার প্রতিযোগিতায় মত্ত। উন্নত প্রযুক্তি আর পরিবহনের সহজলভ্যতা নগরায়নের প্রসারকে আরও ত্বরান্বিত করছে। নাগরিক জীবনের কোলাহল এবং নগরের বৈচিত্র্যময় উপাদান নানা গল্পের বুনোটে বিভিন্ন রূপে উঠে এসেছে। নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনের প্রতিচিত্র অঙ্কনে মঈনুল আহসান সাবের তাঁর স্বতন্ত্র পরিচয় রেখেছেন।

> ঔপন্যাসিক যেখানে অখণ্ড জীবনের উপর দৃষ্টির বিস্তার ঘটান সেখানে গল্পকারের দৃষ্টি নিক্ষেপ তারই কোন খণ্ডিত অংশের উপর। জীবনের খণ্ডিত অংশের রূপায়ণে অখণ্ডিত

> ব্যঞ্জনা সৃষ্টিই ছোটগল্পকারের শিল্পসিদ্ধির মাপকাঠি। এই শিল্পসিদ্ধির প্রথম অবলম্বন বিষয় নির্বাচন।[২]

উপমা, উৎপ্রেক্ষা কিংবা চিত্রকল্পের চাকচিক্য নয়; বরং সহজ গদ্য ভাষার ভেতর দিয়ে মঈনুল আহসান সাবের মনোলোক উদ্ভাসনের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁর গল্প বিশ্লেষণ করতে হলে চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে সন্দীপক মল্লিক যথার্থই বলেছেন, "কথাশিল্পের বহিঃসৌন্দর্যই সব নয়। অন্তঃসৌন্দর্য অন্বেষণ করতে হবে।"[৩] মঈনুল আহসান সাবেরের গল্পগুলোতে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাপনের অন্তর্গত দিকগুলো স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। তাঁর সমাজনিরীক্ষা এবং মনোবিশ্লেষণের ক্ষমতা এসব গল্পে বারবার এসেছে। এখানে ফুটে উঠেছে নাগরিক মধ্যবিত্তের অবদমিত কামনা, জীবনের নিরর্থকতা ও গতানুগতিকতা। লেখক তাঁর অবস্থান ধরে রেখেছেন নিরাসক্ত, নির্মোহ এবং নির্দয় বাস্তব উপস্থাপনে। মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতাকে তিনি একধরনের পরাজিত অবস্থায় তুলে ধরেছেন। নাগরিক মধ্যবিত্তের চরিত্রকে তিনি দেখিয়েছেন বহু মুখোশধারী, যারা প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন সংকট মোকাবিলায় বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পোশাক আর অবয়ব ছাড়া সকল মানুষের যুদ্ধটা একই। এই যুদ্ধে টিকে থাকার কৌশলও তারা রপ্ত করেছে, যা সাবেরের 'মুখোশ' গল্পে স্পষ্ট। যেখানে মুখোশের আড়ালে নিজেকে হারিয়ে খুঁজছে আর বলছে, "আমি কই, আমি কই, আমি কোনটা।"[৪]

২.

মঈনুল আহসান সাবেরের গল্পসমূহে নগরজীবনের যান্ত্রিক চাপ ও অস্তিত্বসংকটে বিপর্যস্ত, গ্রামীণ ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের গভীর আর্তি প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত 'সীমাবদ্ধ' সিরিজের তিনটি গল্পে তিনি এমন কিছু চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন, যারা সাময়িকভাবে বন, পাহাড় কিংবা প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে আশ্রয় লাভ করে। এসব গল্পে প্রকৃতি চরিত্রের মানসিক বিকাশ, সম্পর্কের রূপান্তর এবং আত্ম-অন্বেষণের সক্রিয় অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। গল্পকার প্রকৃতির নান্দনিক ও প্রশান্তিময় রূপকে অত্যন্ত শিল্পসুষমায় চিত্রিত করলেও শেষপর্যন্ত চরিত্রগুলোকে নগরবাস্তবতার কঠোর ও নির্মম পরিসরে প্রত্যাবর্তন করান। ফলে প্রকৃতির কোমলতা ও শহুরে জীবনের নিষ্ঠুরতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'সীমাবদ্ধ: এক' গল্পে প্রধান চরিত্রদ্বয়ের কোনো নাম উল্লেখ করা হয়নি। এক নির্জন বাংলোয় শহর থেকে আগত গল্প কথক এবং অপহৃত এক তরুণীর আকস্মিক সাক্ষাৎ ঘটে। অতি স্বল্প সময়ের আলাপচারিতার মধ্যেই কথক তরুণীকে উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকে নিয়ে গভীর অরণ্যের পথে যাত্রা করেন। একইভাবে, অপহরণকারীদের কবল থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় তরুণীও কথকের ওপর আস্থা স্থাপন করে তার সঙ্গে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। রাত্রির নিস্তব্ধতা, অরণ্যের ঘন বৃক্ষরাজি এবং মাটির গন্ধের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হতে তারা যেমন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে, তেমনি পারস্পরিক অপরিচয়ের দূরত্বও ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়। ফলে গল্পটিতে অচেনা মানুষের প্রতি বিশ্বাস এবং প্রকৃতির নিবিড় আশ্রয়ে একটি নতুন মানবিক সম্পর্কের সূচনা হয়। 'সীমাবদ্ধ: দুই' গল্পে কথক ও জয়ার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। বিয়ের জন্য পারিবারিক সম্মতি না পাওয়ায় তারা গৃহত্যাগ করে পাহাড়ি অঞ্চলে কর্মরত বন্ধু আহাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাহাড়ের নির্জন ও শান্ত পরিবেশে তারা একটি নতুন জীবনের স্বপ্ন নির্মাণের চেষ্টা করে। এখানে প্রকৃতি তাদের জন্য সামাজিক বিধিনিষেধ ও পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ থেকে সাময়িক মুক্তির প্রতীক। অন্যদিকে 'সীমাবদ্ধ: তিন' গল্পে নীলা ও কথক নবদম্পতি; মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে তারা বন্ধু জামানের কাছে এসেছে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে অবস্থান করতে গিয়ে তাদের সম্পর্ক, অনুভূতি এবং পারস্পরিক উপলব্ধির নতুন মাত্রা উন্মোচিত হয়।

এই তিনটি গল্পে ছয়জন মানুষের জীবন, তিনটি পৃথক সম্পর্ক এবং তিন ধরনের অভিজ্ঞতা উপস্থাপিত হলেও গল্পকার সেগুলোকে একটি অভিন্ন ভাবনা ও শিল্পকাঠামোর মধ্যে সংযুক্ত করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি ও চরিত্রগত দৃষ্টিভঙ্গিকে একসূত্রে গেঁথে তিনি তাঁর আখ্যাননির্মাণের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। একই প্রেক্ষিতের ভেতরে স্বতন্ত্র ঘটনাবিন্যাস নির্মাণের মাধ্যমে তিনি গল্প বলার এক অনন্য কৌশল প্রদর্শন করেছেন। সিরিজের প্রতিটি গল্পেই প্রকৃতি ও মানবমনের অন্তর্গত সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। একই সঙ্গে নগরজীবনের জটিলতা, বিচ্ছিন্নতা ও কঠোরতার বিপরীতে প্রকৃতির প্রশান্তি, কোমলতা এবং পুনরুজ্জীবনক্ষমতার তুলনামূলক রূপ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনটি গল্পকে সমগ্রভাবে বিবেচনা করলে লেখকের চিন্তার গভীরতা, মানব-অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং সৃজনশীল শিল্পদৃষ্টির ব্যাপ্তি আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃতি এখানে মানুষের মানসিক আশ্রয়, সম্পর্কের পুনর্গঠন এবং আত্মিক প্রশান্তির উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অন্যদিকে শহরকে উপস্থাপন করা হয়েছে মানসিক ক্লান্তি, যান্ত্রিকতা এবং অস্তিত্বগত সংকটের প্রতীক হিসেবে। 'সীমাবদ্ধ: এক' গল্পে কথকের অনুভূতির মধ্যেও এই দ্বৈত বাস্তবতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়—

> বাতাসের শব্দ, পাখির ডাক এসব আধাচ্ছন্ন মনে টের পাচ্ছিলাম। আগে আনসোমনিয়ায় ভুগতাম। ঘুমের বড়ি খেয়েও শহরের ধূসর আকাশ আর গুচ্ছ গুচ্ছ কালো তার দেখে রাত কেটেছে। ঘুমের বড়ি বোধহয় শরীরের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে, মনের উপর নয়। এখন অবশ্য ঘুমের জন্যে আমাকে ভাবতে হয় না। এক, দুই, তিন, চার করে গুনতে হয় না। কী নদীর ধার, বনজঙ্গল, শূন্যমাঠ-শুয়ে পড়লেই ঘুম।[৫]

উদ্ধৃত অংশে প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানুষের মানসিক প্রশান্তি লাভের অভিজ্ঞতা এবং নগরজীবনের উদ্বেগ, অনিদ্রা ও মানসিক অস্থিরতার মধ্যকার তীব্র বৈপরীত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মঈনুল আহসান সাবের তাঁর আখ্যানশৈলীর মাধ্যমে চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, সামাজিক বাস্তবতা এবং প্রকৃতির নিরাময়ক্ষম প্রভাবকে শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপন করেছেন।

'সীমাবদ্ধ: দুই' গল্পে প্রকৃতি এক ভিন্নতর নান্দনিক ও মানসিক তাৎপর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। ডাকবাংলোর একঘেয়ে পরিবেশে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে করতে জয়া ও কথক যখন মানসিক ক্লান্তি ও বিরক্তি অনুভব করে, তখন তারা প্রকৃতির সান্নিধ্যে বিচরণের উদ্দেশ্যে বাইরে বেরিয়ে আসে। সবুজ বৃক্ষরাজি, পাখির কলতান এবং নিসর্গের অনাবিল সৌন্দর্য তাদের এমন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে, যা তাদের পরিচিত জীবনবোধ ও কল্পনার পরিসরকে অতিক্রম করে যায়। প্রকৃতির এই নির্মল ও স্নিগ্ধ পরিবেশ তাদের মানসিক প্রশান্তি প্রদান করে। প্রকৃতির এই অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে লেখক মন্তব্য করেন—

> নিসর্গ আমাদের ফাঁকি দেয় না। আমরা যতই এগোই, বনভূমির সৌন্দর্য ততই বেড়ে যায়। সূর্যের শেষ আলো চারপাশের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দিয়েছে। গাছের শরীর এবং পাতাগুলো চকচকে। তারা রোদের তেজ শুষে নেয়, অবশিষ্ট যেটুকু রোদ নেমে আসে তা চমৎকার।[৬]

উদ্ধৃত অংশে প্রকৃতিকে এমন এক নির্ভরযোগ্য ও উদার সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার সৌন্দর্য মানবমনের ওপর ক্রমবর্ধমান ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। এখানে প্রকৃতি মানুষের অনুভূতি, চিন্তা ও মানসিক পরিতৃপ্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

অপরদিকে 'সীমাবদ্ধ: তিন' গল্পে প্রকৃতির উপস্থিতি আরও বিস্তৃত, গভীর এবং আত্মিক মাত্রা লাভ করেছে। এই গল্পের চরিত্ররা যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার এক অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষায় পরিচালিত। নীলা ও কথক মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে যে বনাঞ্চল-সংলগ্ন পরিবেশে অবস্থান করে, সেখানে নদীর

প্রবাহ, বাতাসের স্নিগ্ধতা, জ্যোৎস্নাময় প্রান্তর এবং গ্রামীণ জীবনের সরলতা তাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। পারিবারিক অনীহা, বিশেষত ছোটবোন মীলার বিদ্রূপ এবং পিতার অসন্তোষ সত্ত্বেও নীলা এখানে ঘুরতে আসে। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে এসে সে এক নতুন মানসিক পরিতৃপ্তি অর্জন করে। এই পরিবেশে অবস্থান করতে গিয়ে তারা নিজেদের সম্পর্ক, অস্তিত্ব এবং জীবনবোধকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার সুযোগ লাভ করে। নীলার অনুভূতি গল্পে নিম্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে-

> বনভূমি থেকে বেরিয়েই খোলা প্রান্তর, তার আরেকটু সামনে নদী। এখন রাত বেশি বলেই বোধ হয়, নদীটিকে আরো বিশাল মনে হয়। নীলা কতক্ষণ নদীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলে- মনে হচ্ছে আমরা এক নতুন পৃথিবীতে এসে হাজির হয়েছি, তাই না? ... চমৎকার জ্যোৎস্না ফুটে আছে আমাদের অস্থায়ী পথের ওপর। নদীর বুকে চাঁদের আলো ইচ্ছা মতো ভাঙছে খেলছে। কখনো বাতাস বয়ে যাচ্ছে একটানা। নীলা হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলে- আমার কী মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে, এটা আমাদেরই জায়গা, বহু আগে, ভুলে গেছি কবে ছেড়ে গিয়েছিলাম, এখন আবার ফিরে এসেছি।[৭]

এই উদ্ধৃতিতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এক গভীর আত্মিক সম্পর্কের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। নীলার অনুভূতিতে প্রকৃতি হারিয়ে যাওয়া কোনো আদিম আশ্রয় কিংবা অস্তিত্বের মৌলিক আবাসভূমি হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। ফলে প্রকৃতি এখানে স্মৃতি, আত্মপরিচয় এবং অন্তর্গত শান্তির এক প্রতীকী পরিসর নির্মাণ করেছে।

বাংলা সাহিত্যধারায় প্রকৃতি বরাবরই একটি গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। এর প্রাণময়তা, নির্মলতা ও প্রশান্তিদায়ক বৈশিষ্ট্য মানবজীবনের শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অতীতে আরোগ্যলাভের উদ্দেশ্যে রোগীদের প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থানের পরামর্শ দেওয়ার প্রচলনও ছিল, যা প্রকৃতির নিরাময়ক্ষমতার প্রতি সামাজিক আস্থারই বহিঃপ্রকাশ। বাংলা গল্প-উপন্যাসের দীর্ঘ ঐতিহ্যেও প্রকৃতির এই প্রশান্তিদায়ক ও পুনরুজ্জীবনকারী ভূমিকা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

'সীমাবদ্ধ' সিরিজের গল্পসমূহে প্রকৃতি সক্রিয় ও অর্থবহ। প্রতিটি গল্পে প্রকৃতি নিজস্ব ভাষায় চরিত্রগুলোর অনুভূতি, সংকট ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিধ্বনিত করেছে। মানবমনের সুপ্ত সম্ভাবনার উন্মেষ, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের নতুন বিন্যাস এবং জীবনবোধের পুনর্নির্মাণ প্রকৃতির সান্নিধ্যেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে। মঈনুল আহসান সাবের তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তি ও শিল্পসচেতন বর্ণনাকৌশলের মাধ্যমে প্রকৃতির স্নিগ্ধতা, বিশালতা এবং মানবমনের ওপর তার গভীর প্রভাবকে দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের জৈবিক ও মানসিক চাহিদা প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃতির সান্নিধ্যে অবস্থান করলে মানবসত্তার সুপ্ত অনুভূতি, প্রবৃত্তি এবং আবেগ নতুন তীব্রতায় জাগ্রত হতে পারে। এ সময় ব্যক্তি নিজেকে বৃহত্তর প্রাকৃতিক অস্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অনুভব করে। মঈনুল আহসান সাবের 'সীমাবদ্ধ' সিরিজের গল্পসমূহে প্রকৃতির এই রূপান্তরকারী শক্তিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর আখ্যানের বিভিন্ন চরিত্র প্রকৃতির নিবিড় পরিবেশে এসে সামাজিক অনুশাসন, মানসিক সংকোচ এবং দৈনন্দিন জীবনের কৃত্রিমতা অতিক্রম করে নিজেদের অন্তর্নিহিত আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার মুখোমুখি হয়েছে।

'সীমাবদ্ধ: এক' গল্পে দেখা যায়, বিপদসংকুল পরিস্থিতি অতিক্রম করার পর সম্পূর্ণ অপরিচিত দুই মানুষের মধ্যে দ্রুত এক ধরনের মানসিক নৈকট্য গড়ে ওঠে। অরণ্যের নির্জন পরিবেশ, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সামাজিক কাঠামোর অনুপস্থিতি তাদের সম্পর্ককে একটি নতুন মাত্রা প্রদান করেছে।

তরুণীর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ, তার প্রাণবন্ত উপস্থিতি এবং প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশ কথকের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের জন্ম দেয়। গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এই আকর্ষণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে-

> সে তখন উঠে এসে আমার সমস্ত শরীর সাপটে ধরে প্রায়- এইবার কোথায় যাবেন? মাত্র ইঞ্চি পাঁচেক দূর থেকে সে লক্ষ্যস্থির করে। আমার নড়াচড়ার উপায় নেই। তার লক্ষ্য আর ভ্রষ্ট হয় না। তার বুকের একাংশ পিষে আছে আমার বাহুতে। ব্লাউজের উপরিভাগ ঢিলা হয়ে যাওয়ায় চোখ রাখলেই দেখা যায় ভয়ঙ্কর খাঁজ। আমি ভাবছিলাম খাঁজের ঠিক মাঝখানে ইট ফেলব।[৮]

উদ্ধৃত অংশে শারীরিক আকর্ষণের প্রত্যক্ষ প্রকাশ থাকলেও তা শুধু ব্যক্তিগত কামনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে সামাজিক দূরত্ব ও অপরিচয়ের প্রাচীর দ্রুত ভেঙে গিয়ে মানবিক ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। অল্প সময়ের সহাবস্থানই দুই চরিত্রকে মানসিক ও শারীরিক একাত্মতার সম্ভাবনার দিকে পরিচালিত করে।

'সীমাবদ্ধ: দুই' গল্পেও প্রকৃতির প্রভাব চরিত্রের আবেগজগতে গভীর অভিঘাত সৃষ্টি করে। জয়া ও কথকের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের ভালোবাসার ভিত্তিতে নির্মিত হলেও সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে তা পরিণতি লাভ করতে পারেনি। ফলে জয়া একদিকে প্রেমিকের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করলেও অন্যদিকে সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে নিজেকে সংযত রাখে। ডাকবাংলোয় অবস্থানকালে একাধিকবার ঘনিষ্ঠতার সুযোগ সৃষ্টি হলেও সে সামাজিক ও নৈতিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হতে চায় না। কিন্তু প্রকৃতির নিবিড় পরিবেশে প্রবেশ করার পর তার মানসিক অবস্থায় পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অরণ্যের প্রশান্তি, বাতাসের কোমল স্পর্শ এবং নিসর্গের সম্মোহনী আবহ তার দীর্ঘদিনের সংযমকে শিথিল করে দেয়। এই পর্যায়ে গল্পকারের ভাষা লক্ষণীয়ভাবে রূপকধর্মী ও কাব্যিক হয়ে ওঠে। সাধারণ আখ্যানভাষা পরিত্যাগ করে তিনি প্রতীক, উপমা এবং প্রকৃতিচিত্রের সাহায্যে চরিত্রদ্বয়ের আবেগময় মিলনকে উপস্থাপন করেছেন। ফলে ঘটনাটি সরাসরি বর্ণনার পরিবর্তে এক নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়েছে। অরণ্য, পাখির ডাক, বাতাসের প্রবাহ এবং বন্য প্রাণীর গর্জন- সমস্ত প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ যেন চরিত্রগুলোর অন্তর্গত আবেগের প্রতিধ্বনি হিসেবে কাজ করেছে।

> আমার শরীরে কোথায় লুকানো ছিল এত ক্রোধ। সবুজ টিয়ে তাদের ধারালো ঠোঁট নিয়েও গুড়িয়ে যায়; আর কী উত্তাপে সেই কালচে গোলাপের পাঁপড়ি সামান্য স্পন্দিত হয়, সব কুয়াশা গলে গিয়ে সামান্য ছলকে ওঠে। কিন্তু জয়া কি আমাকেও ছাড়িয়ে যাবে! ও ক্রমশ এমন তীব্র-প্রবল হয়ে ওঠে, যেন বুনো কোনো ঘোড়া চারদিকে তোলপাড় করে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ পেছনে দু পাশে ওপর ভর রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে।[৯]

জয়ার আচরণে লক্ষ করা যায়, দীর্ঘদিন ধরে নিয়ন্ত্রিত আবেগ প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে এক নতুন প্রকাশভঙ্গি লাভ করেছে। সামাজিক অনুশাসনের কারণে যে অনুভূতিকে সে এতদিন দমন করে রেখেছিল, প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিসরে এসে সেই অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে তার চরিত্রে আত্মসমর্পণ নয়, আত্মপ্রকাশের প্রবণতা দৃশ্যমান হয়। একই প্রবণতা 'সীমাবদ্ধ: তিন' গল্পেও পরিলক্ষিত হয়। নীলা ও কথকের সম্পর্ক বৈবাহিক স্বীকৃতি লাভ করলেও প্রকৃতির পরিবেশে এসে তারা নিজেদের সম্পর্ককে নতুনভাবে অনুভব করে। যেখানে দেহগত ঘনিষ্ঠতা প্রকৃতির বৃহত্তর অস্তিত্বের সঙ্গে মানুষের সংযুক্ত হওয়ার এক প্রতীকী অভিজ্ঞতা।

> আমি নীলাকে আঁকড়ে ধরি এবং পর মুহূর্তে দু জন আবার তীব্র অস্থির হয়ে উঠি। কী সহজে এবং অনায়াসে নীলাকে আমি পোশাকের অপ্রয়োজনীয় বন্ধন থেকে মুক্ত করে

> আনি। নিজের অপ্রয়োজনীয় পোশাক ত্যাগ করতেও আমার এতটুকু দেরি হয় না। নীলা হেসে সহজ গলায় বলে- হ্যাঁ এখন, এখন নিশ্চয় আমাদের এই বনভূমি আর নদী তীরের অবিচ্ছিন্ন অংশ মনে হচ্ছে।[১০]

সিরিজের প্রতিটি গল্পেই চরিত্রগুলো নগরজীবনের ক্লান্তিকর যান্ত্রিকতা, কোলাহল, ধূলিধূসর পরিবেশ এবং মানসিক অবসাদ থেকে সাময়িক মুক্তির সন্ধানে প্রকৃতির কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। বনভূমি, নদীতীর কিংবা পাহাড়ি পরিবেশ তাদের কাছে মানসিক পুনর্জাগরণ ও অস্তিত্বগত মুক্তির ক্ষেত্র। প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে তারা নিজেদের অনুভূতি, সম্পর্ক এবং শারীরিক সত্তাকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ফলে প্রকৃতি এখানে মানবিক আবেগের বিকাশ, সম্পর্কের পুনর্নির্মাণ এবং আত্মপরিচয়ের পুনরাবিষ্কারের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানব-আবেগের প্রাণোচ্ছল ও প্রেমময় বিকাশের যে চিত্র 'সীমাবদ্ধ' সিরিজের গল্পসমূহে লক্ষ করা যায়, তার একটি ভিন্নতর ও তাৎপর্যপূর্ণ রূপ 'প্রাকৃতিক' গল্পেও পরিলক্ষিত হয়। তবে এখানে প্রকৃতির প্রভাব প্রেম কিংবা সম্পর্কের বিকাশে সীমাবদ্ধ না থেকে মানবসত্তার অন্তর্গত সহিংস প্রবণতার রূপান্তরের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গল্পটির কথক একজন ধারাবাহিক হত্যাকারী, যার দৈনন্দিন অস্তিত্ব নগরজীবনের নির্মমতা, বিচ্ছিন্নতা এবং হত্যাপ্রবণ মানসিকতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। ঢাকার ব্যস্ত নগরপরিসরে সে নিয়মিতভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে; কখনও গাড়িচাপা দিয়ে, কখনও বা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু শহরের যান্ত্রিক ও হিংস্র পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন সে গ্রামীণ প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন তার মানসিক জগতে এক মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। প্রকৃতির বৃক্ষরাজি, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ এবং সামগ্রিক জীববৈচিত্র্য তাকে এমন এক বিস্ময় ও মুগ্ধতার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে, যা তার দীর্ঘদিনের হত্যাপ্রবণ মানসিকতাকে ক্রমশ নিষ্ক্রিয় করে দেয়। যে তরুণ-তরুণীকে হত্যার উদ্দেশ্যে সে অনুসরণ করছিল, প্রকৃতির পরিবেশে এসে তাদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিও আমূল পরিবর্তিত হয়। প্রথমদিকে তাদের অন্তরঙ্গ অবস্থান তার কাছে বিরক্তিকর ও ঘৃণ্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, এই দৃশ্য যেন ধ্বংস করে দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃতির নিবিড় পরিমণ্ডলে অবস্থান করতে করতে তার উপলব্ধি ভিন্ন দিকে অগ্রসর হয়। যে দৃশ্য একসময় তার কাছে অশ্লীল বলে মনে হয়েছিল, তা-ই ধীরে ধীরে তার দৃষ্টিতে এক অনন্য অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়।

প্রকৃতির সঙ্গে যুগলটির এমন নিবিড় সংযুক্তি সে প্রত্যক্ষ করে যে, তাদের আর পৃথক মানবসত্তা হিসেবে নয়, বরং বৃহত্তর প্রাকৃতিক অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখতে শুরু করে। ফলে তাদের প্রতি সহিংসতা প্রয়োগের চিন্তা তার কাছে প্রকৃতির সামগ্রিক সুষমা ও সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার সমার্থক হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে প্রকৃতি মানবিক সহিংসতার বিরুদ্ধে নৈতিক ও নান্দনিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা কথকের হত্যাকামিতাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। গল্পে এই মানসিক রূপান্তরের মুহূর্তটি নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—

> এক নগ্ন-অশ্লীল দৃশ্যের প্রতি সে এখন বিনা দ্বিধায় গুলি চালাবে ভেবেছিল। কিন্তু সে ভীষণ চমকে গেল। কী আশ্চর্য, এরা কারা? সম্পূর্ণ এক অচেনা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। কিচ্ছু সে বুঝতে পারল না। ঐ দুজন লাবণ্যময় নরনারী কোত্থেকে এলো, সে দুজন কই, যে দুজনকে অনুসরণ করে সে অতটা পথ এসেছে?... পাখিদের ত্রিকোণ ভঙ্গির উড়ে যাওয়া, গাছের কোটর থেকে অদ্ভুত শব্দে ডেকে উঠল কী যেন, চারদিকে বাতাসে শুধু

> গাছের পাতা খসে পড়ছে—এসবের সাথে জড়িয়ে আছে আভাময় যে দুজন নরনারী তারা কারা?[১১]

উদ্ধৃত অংশে কথকের চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। এখানে অনুসৃত তরুণ-তরুণী কেবল সামাজিক পরিচয়ে আবদ্ধ মানুষ নয়, তারা প্রকৃতির সামগ্রিক সৌন্দর্য ও প্রাণপ্রবাহের অংশে পরিণত হয়েছে। পাখির উড্ডয়ন, বৃক্ষের শব্দ, ঝরে পড়া পাতা এবং মানবদেহ- সবকিছু মিলিত হয়ে এক অভিন্ন বাস্তবতা নির্মাণ করেছে। এই বাস্তবতায় সহিংসতা, ধ্বংস কিংবা হত্যা আর স্বাভাবিক বা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

'প্রাকৃতিক' গল্পে প্রকৃতিকে এমন এক রূপান্তরমূলক শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা মানুষের অন্তর্নিহিত হিংস্রতা ও ধ্বংসপ্রবণতার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রকৃতির সজীব উপস্থিতি কথকের দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনর্গঠিত করে তাকে মানবজীবন ও জীবজগতের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে সহায়তা করেছে। গল্পে প্রকৃতি ও মানবচেতনার গভীর সম্পর্ক মানবিক সংবেদনশীলতা ও সহমর্মিতার পুনর্জাগরণের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

৩.

প্রকৃতির কি আদৌ কোনো পৃথক আবরণ বা কৃত্রিম খোলস রয়েছে? মানবদেহের নগ্নতাও কি প্রকৃতিরই এক অনাবৃত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ? মঈনুল আহসান সাবেরের গল্পসমূহ পাঠে এমন প্রশ্নের উদ্ভব হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাঁর চরিত্রগুলোর আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে তারা সামাজিক অনুশাসন, কৃত্রিমতা এবং আত্মসংযমের বহুস্তরীয় আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে এক ধরনের মৌলিক মানবিক সত্তার মুখোমুখি হয়। কিন্তু একই চরিত্র যখন পুনরায় নগরসভ্যতার যান্ত্রিক পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তাদের আচরণ ও মানসিকতায় লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। ফলে গল্পকারের আখ্যানভুবনে প্রকৃতি ও নগরসভ্যতা দুটি ভিন্ন জীবনদর্শন ও মানসিক অবস্থানের প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে। মঈনুল আহসান সাবের তাঁর গল্পে প্রকৃতিকে প্রধানত শহুরে জীবনের কৃত্রিমতা, বিচ্ছিন্নতা এবং মানসিক সংকটকে উন্মোচনের একটি কার্যকর শিল্পকৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'সীমাবদ্ধ' সিরিজের গল্পগুলোতে বারবার লক্ষ করা যায়, প্রকৃতির পরিবেশে চরিত্রগুলো যতটা স্বাভাবিক, সংবেদনশীল এবং আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে, নগরজীবনে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্বতঃস্ফূর্ততা বিলুপ্ত হতে শুরু করে। প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিসর যেখানে মানবিক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করে তোলে, সেখানে নগরসভ্যতার কাঠামোবদ্ধ বাস্তবতা সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব ও সংকোচ সৃষ্টি করে। এই দ্বৈততার মধ্য দিয়েই গল্পগুলো শহুরে জীবনে প্রকৃতির ক্রমসংকুচিত অবস্থান এবং তার অনুপস্থিতিজনিত মানসিক শূন্যতার বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে।

'সীমাবদ্ধ: এক' গল্পে এই রূপান্তর বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অরণ্যের পরিবেশে যে তরুণী সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন মানুষের সঙ্গে নির্ভয়ে পথচলা, জলক্রীড়া কিংবা আবেগঘন পরিস্থিতিতে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, শহরের সীমানায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার আচরণে এক ধরনের সংযম ও দূরত্ব ফিরে আসে। গল্পকার এই পরিবর্তনকে উপস্থাপন করেছেন-

> আমরা তখন প্রায় শহরের মাঝখানে। সে কী গর্জন চারপাশে, যান্ত্রিক বাহন আর যেন লোহার পাত পায়ে আঁটা মানুষের উদভ্রান্ত দৌড়- অনির্দিষ্ট ছোটাছুটি, কী ঘোর কালো বর্ণে ছাওয়া আকাশ, কারখানার বিকট গর্জন। মেয়েটা আমার নাগাল থেকে সরে গিয়ে টেনে টেনে বুকের আঁচল বার বার ঠিক করে, বিন্যস্ত শাড়ি আরও বিন্যস্ত করতে চায়, সহজ

> ভঙ্গির হাঁটা ছেড়ে কেমন জড়িয়ে পা ফেলে। আড়চোখে সে আমাকে দেখে আর আমরা যত শহরের ভেতরে যাই ক্রমশ, ততই সে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়।[১২]

উদ্ধৃত অংশে শহরকে এমন একটি নিয়ন্ত্রণমূলক পরিসর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে ব্যক্তি তার স্বাভাবিক আচরণ পরিত্যাগ করে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য পরিচয়ের মধ্যে নিজেকে পুনর্গঠিত করতে বাধ্য হয়। যে মানুষটি কিছুক্ষণ আগেও তার নিরাপত্তা, আস্থা এবং আবেগের কেন্দ্র ছিল, শহরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সে তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এখানে গল্পকার আধুনিক নগরসভ্যতা মানবিক সম্পর্কের মধ্যে যে অদৃশ্য দূরত্ব সৃষ্টি করে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

'সীমাবদ্ধ: দুই' গল্পেও একই ধরনের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা যায়। জয়া দীর্ঘদিন ধরে নিজের আবেগকে সামাজিক বিধিনিষেধের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রেখেছিল। কিন্তু প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে এসে সেই সংযম ক্রমশ শিথিল হতে থাকে এবং তার অনুভূতি অধিকতর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। তবে এই মুক্ত আবেগের প্রবাহ হঠাৎ ব্যাহত হয় একটি সার্ভে প্লেনের উপস্থিতিতে। প্রযুক্তির প্রতীকী উপস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে চরিত্রদ্বয়ের মানসিক অবস্থাকে পরিবর্তিত করে দেয়। গল্পকার লিখেছেন—

> আমি অস্থির ও তীব্র হাত জয়ার দিকে বাড়িয়ে দিতে পারি না। আমার শরীর জুড়েও নিভে আসে বুনো ক্রোধ যা জয়াকে দীর্ণ করে দিতে পারত। আমার শরীর জুড়ে আবার জেগে ওঠে সার্বক্ষণিক দ্বিধা ও সঙ্কোচ। আমি ভীরু ও অভিমানী চোখ তুলে জয়ার দিকে তাকিয়ে থাকি।
>
> সেই শব্দ আমাদের চারপাশে বেজে যায়। আমাদের শরীরের ভেতর ঢুকে পড়ে। আমাদের শরীর আর আমাদের থাকে না।[১৩]

এই অংশে প্রযুক্তিগত উপস্থিতি চরিত্রের মানসিক ও শারীরিক অভিজ্ঞতার ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রকৃতির মধ্যে অর্জিত স্বতঃস্ফূর্ততা মুহূর্তের মধ্যে সংকুচিত হয়ে যায় এবং তার স্থানে ফিরে আসে সামাজিক সংকোচ, আত্মসচেতনতা ও নিয়ন্ত্রণবোধ। গল্পকার যেন এখানে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতার এক গভীর সংকটকে নির্দেশ করেছেন, যেখানে মানুষের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা ক্রমশ বাহ্যিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে।

'সীমাবদ্ধ: তিন' গল্পে প্রকৃতি ও নগরজীবনের এই দ্বন্দ্ব আরও সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। নীলা প্রথমে নদী, বনভূমি এবং গ্রামীণ পরিবেশের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। তার মনে হয়, এই প্রকৃতির মাঝেই চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করা সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতির বিশালতা ও অপ্রতিরোধ্য শক্তির মুখোমুখি হওয়ার পর তার অনুভূতিতে পরিবর্তন আসে। রাতের নদী এবং তার রহস্যময় সৌন্দর্য তাকে বিস্মিত ও আতঙ্কিত করে। ফলে সে পুনরায় মানুষের নির্মিত নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ফিরে আসতে চায়।

> পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে আমরা বাংলোর কাছে পৌঁছে যাই। কোনো দিকে তাকাই না আমরা। ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দেই। আমরা হাঁপাই কিন্তু তৃপ্তিতে আমাদের চোখমুখ চকচক করে। আমাদের ছোট ঘর, দুপা হাঁটলে তার দেয়াল, মাথার দেড়হাত ওপরে ছাদ, ঘরে জ্বলছে বিদ্যুতের ম্যাটমেটে আলো, তিন ব্লেডের ফ্যান সীমিত পরিসরে নিয়ন্ত্রিত বাতাস ছড়াচ্ছে। আমরা স্বস্তি বোধ করি।[১৪]

এই উদ্ধৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে রয়েছে প্রকৃতির অসীম ও অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার, অন্যদিকে মানুষের নির্মিত সীমাবদ্ধ কিন্তু নিরাপদ আবাস। প্রকৃতির বিপুলতা মানুষকে যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি সেই বিপুলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ প্রায়ই নিজেকে অসহায় অনুভব করে। ফলে সে

পুনরায় পরিচিত, নিয়ন্ত্রিত ও কাঠামোবদ্ধ পরিবেশে আশ্রয় খোঁজে। একই ধরনের প্রতিক্রিয়া 'প্রাকৃতিক' গল্পেও লক্ষ করা যায়। সেখানে ধারাবাহিক হত্যাকারী কথক প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানবদেহের স্বাভাবিকতা এবং জীবনের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির মুখোমুখি হয়ে তার সহিংস প্রবৃত্তি থেকে বিচ্যুত হয়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা তাকে একই সঙ্গে বিস্মিত ও বিচলিত করে তোলে। ফলে সেও শেষপর্যন্ত নগরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এই ঘটনাপ্রবাহ নির্দেশ করে যে, আধুনিক নগরসভ্যতায় বসবাসকারী মানুষ প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেও তার পূর্ণতা ও বিশালতাকে ধারণ করার মানসিক প্রস্তুতি অনেকাংশেই হারিয়ে ফেলেছে।

৪.

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মঈনুল আহসান সাবেরের 'গ্রাস' এবং 'হন্তারক' গল্প দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয় গল্পেই প্রকৃতি ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সভ্যতার মধ্যকার দ্বন্দ্বকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষত 'গ্রাস' গল্পে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং শিল্পায়নের ফলে প্রকৃতি ও মানবিক সত্তার অবক্ষয়ের বিষয়টি চিত্রিত হয়েছে। 'গ্রাস' গল্পের কথক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে রোবট কারখানা বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির উদ্দেশ্যে রাহীপুরে আগমন করেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তিনি বিস্মিত ও মর্মাহত হন। কারণ, মাত্র দুই বছর পূর্বে পিকনিক উপলক্ষে এই গ্রামে এসে তিনি যে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিস্তীর্ণ বিল, বৃক্ষরাজি এবং নিসর্গমণ্ডিত সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তা ইতোমধ্যে দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। শিল্পায়নের আগ্রাসী বিস্তার গ্রামীণ পরিবেশকে গ্রাস করতে শুরু করেছে; প্রাকৃতিক দৃশ্যের স্থানে গড়ে উঠছে কলকারখানা, আর জীবন্ত প্রকৃতির পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কংক্রিটনির্ভর যান্ত্রিক অবকাঠামো।

গল্পকার এই পরিবর্তনকে পরিবেশগত পরিবর্তনের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। কারখানার বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছে রোবট। এমনকি রিসেপশন পরিচালনা থেকে শুরু করে অন্যান্য কার্যক্রমেও রোবটের উপস্থিতি এতটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যে কথকের পক্ষে মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, কারখানার তত্ত্বাবধায়ক আহমেদ তরফদারের পুত্র জিয়া মানুষ হয়েও তার আচরণ সম্পূর্ণ যান্ত্রিক। এই প্রসঙ্গে তরফদারের মন্তব্য- "আমরা কোটি কোটি টাকা ঢালছি, হাজার হাজার বিজ্ঞানীকে জড়ো করেছি, দিন রাত কাজ করে চলেছি- কারণ আমরা ঠিক মানুষের মতো রোবট বানাতে চাই। কিন্তু সাংবাদিক সাহেব, মানুষ যে ক্রমশ..."[১৫] এই অসমাপ্ত উচ্চারণের মধ্যেই গল্পকারের মূল উদ্বেগ নিহিত রয়েছে। মানুষ যখন মানুষের মতো রোবট নির্মাণে ব্যস্ত, তখন মানুষ নিজেই ক্রমশ রোবটসদৃশ সত্তায় পরিণত হচ্ছে। অনুভূতি, সহমর্মিতা, প্রেম ও মানবিক সংবেদনশীলতা ধীরে ধীরে তার জীবন থেকে বিলুপ্ত হচ্ছে। ফলে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি প্রকৃতিকে গ্রাস করার পাশাপাশি মানুষের মানবিক সত্তাকেও সংকুচিত করছে। এই উদ্বেগেরই শিল্পিত প্রকাশ লক্ষ করা যায় নিম্নোক্ত বর্ণনায়-

> স্বাদহীন, গন্ধহীন খানিকটা পথ অতিক্রম করতেই প্রথমে চোখে পড়ল সিমেন্ট রঙের কালো বাড়িটা। কারখানা সন্দেহ নেই। বিশ্রী কালো ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। অবশিষ্ট গাছের পাতাগুলোও হলুদ হবে, খসে খসে পড়বে।... আশেপাশে দ্রুত আরো কারখানা উঠে যাচ্ছে। চতুর্দিক শূন্য হয়ে যাবে। এখন কারখানা হচ্ছে, দোকান বসবে বাজার, মানুষ এসে ভিড় বাড়াবে। মানুষের চোখে হিংসা হাতে ধ্বংস জ্বলে উঠবে।[১৬]

এখানে শিল্পায়ন বৃহত্তর সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতির বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মানবিক সংবেদনশীলতাও যেন ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। অন্যদিকে 'হন্তারক' গল্পে প্রকৃতির প্রভাব মানবমনের সহিংস প্রবৃত্তির ওপর কীভাবে কার্যকর হয়, তার একটি ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপন লক্ষ করা যায়।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সেকান্দার পেশাদার অপরাধী। তারেকের কাছে নেতৃত্ব এবং প্রেমিকা সহেলীকে হারানোর অপমান তাকে প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত করে তোলে। এই ক্রোধ থেকেই সে তারেককে হত্যার পরিকল্পনা করে এবং পরিকল্পিতভাবে তাকে শহর থেকে দূরে একটি গ্রামীণ পরিবেশে নিয়ে যায়। প্রথমদিকে গ্রামীণ নদীতীর, পাটক্ষেত এবং নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশকে সে হত্যাকাণ্ড সংঘটনের উপযুক্ত স্থান বলে মনে করে। কিন্তু হত্যার চূড়ান্ত মুহূর্তে তার মানসিক অবস্থায় এক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটে। প্রকৃতির নীরবতা, শস্যক্ষেতের সবুজ বিস্তার, নদীর প্রবাহ, আকাশের প্রশান্তি এবং চারপাশের প্রাণময় পরিবেশ তার চেতনায় গভীর অভিঘাত সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ, প্রতিশোধস্পৃহা, অপমানবোধ এবং সহিংসতার তাড়না ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আসে। গল্পকার এই মানসিক রূপান্তরকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন-

> এইবার এইবার- বলে পিস্তলে হাত দিল সেকেন্দার, ঠিক সে সময় চারপাশের দোলায় তার শরীর কেঁপে উঠল। কাঁপা হাত এক ঝটকায় পিস্তল থেকে সরিয়ে আনল সে। এই সমগ্র চারপাশ কী ভীষণ নীরব, কী নিথর। এই বিশাল নীরবতা যেন ঝড়ের মতো পেঁচিয়ে উঠে তার মন থেকে অপমান, অহংকার, হিংসা ও ভালবাসা সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে... খুন করলে ঐ হাটের মধ্যে করতে হতো- সে ভাবল, এইখানে পিস্তল সে ওঠাতে পারে না।[১৭]

এই অংশে প্রকৃতি এক নৈতিক ও মানসিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা মানুষের অন্তর্নিহিত সহিংসতাকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। সেকান্দারের মতো একজন পেশাদার হত্যাকারীও প্রকৃতির গভীর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। প্রকৃতির বিশালতা ও প্রশান্তি তার প্রতিশোধস্পৃহাকে অর্থহীন করে তোলে। একই প্রবণতা 'প্রাকৃতিক' গল্পেও লক্ষ করা যায়। সেখানে ধারাবাহিক হত্যাকারী কথকও প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং জীবনের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির মুখোমুখি হয়ে তার হত্যার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়,

> "তার হাত থেকে পিস্তল খসে যায়। তার ক্ষোভ, অভিমান এবং যন্ত্রণা দুলে উঠে ভেসে যেতে চায় সেই হাসির স্রোতে। সে ভয় পায়, পেছন ফিরে শহরের দিকে ছুটতে আরম্ভ করে।"[১৮]

এই ঘটনাপ্রবাহ থেকে প্রতীয়মান হয়, গল্পকারের দৃষ্টিতে প্রকৃতি কেবল সৌন্দর্যের আধার নয়; বরং তা মানুষের অন্তর্নিহিত মানবিকতাকে জাগ্রত করার একটি শক্তিশালী অনুঘটক। প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে মানুষের মধ্যে সুপ্ত সহমর্মিতা, সংবেদনশীলতা এবং জীবনমুখী চেতনা পুনরুজ্জীবিত হতে পারে।

'প্রাকৃতিক', 'গ্রাস', 'হন্তারক' এবং 'সীমাবদ্ধ' সিরিজের গল্পসমূহ সমগ্রভাবে বিবেচনা করলে মঈনুল আহসান সাবেরের প্রতীকনির্ভর আখ্যানকৌশলের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এসব গল্পে প্রকৃতি মানবিকতার প্রতীক হিসেবে উপস্থিত। বিপরীতে নগরসভ্যতা, প্রযুক্তি এবং যান্ত্রিক জীবনধারা প্রতীকায়িত করেছে বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব, সংবেদনশীলতার অবক্ষয় এবং অস্তিত্বগত সংকটকে। সাবের দেখিয়েছেন, আধুনিক যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার ক্রমবর্ধমান প্রভাব মানুষের স্বাভাবিক জীবনবোধ, পারস্পরিক বিশ্বাস, মমত্ববোধ এবং সামাজিক সংযোগকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এর ফলে ব্যক্তি ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক, বাণিজ্যিক এবং বিচ্ছিন্ন সত্তায় পরিণত হচ্ছে। এই বিচ্ছিন্নতা শুধু মানুষে-মানুষে সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককেও গভীরভাবে বিপর্যস্ত করছে। প্রকৃতি মানুষের অনুভূতিকে প্রসারিত করে এবং অধিকতর মানবিক করে তোলে; তার অনুপস্থিতিতে মানুষ মানসিকভাবে ক্লান্ত, অস্থির এবং বিপন্ন হয়ে ওঠে। তবুও আধুনিক মানুষ ক্রমাগত সেই যান্ত্রিক জীবনধারার প্রতিই অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। আলোচ্য গল্পসমূহে মঈনুল আহসান সাবের প্রকৃতি ও আধুনিক সভ্যতার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে সমকালীন মানুষের অস্তিত্বগত সংকট, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের একটি গভীর শিল্পিত ভাষ্য নির্মাণ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান। *সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু*। মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ৫৯।
২. চক্রবর্তী, সুবোধ। *বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড* (সম্পাদিত)। শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৯১, কলকাতা, পৃ. ৩৬৮।
৩. মল্লিক, সন্দীপক। *অন্নদাশঙ্কর রায়: সাহিত্য ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা*। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯৯৪, ঢাকা, পৃ. ১৩৪।
৪. সাবের, মঈনুল আহসান। *পরাস্ত সহিস*। পূর্বা, ১৯৮২, ঢাকা, পৃ. ৪৩।
৫. সাবের, মঈনুল আহসান। *গল্পসমগ্র* ২। দিব্যপ্রকাশ, ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৭১।
৬. তদেব, পৃ. ১১৫।
৭. তদেব, পৃ. ১৪৮।
৮. তদেব, পৃ. ৮৯।
৯. তদেব, পৃ. ১১৬।
১০. তদেব, পৃ. ১৫০।
১১. সাবের, মঈনুল আহসান। *গল্পসমগ্র* ১। দিব্যপ্রকাশ, ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৮০।
১২. সাবের, মঈনুল আহসান। *গল্পসমগ্র* ২। দিব্যপ্রকাশ, ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৯৬।
১৩. তদেব, পৃ. ১১৬।
১৪. তদেব, পৃ. ১৫২।
১৫. সাবের, মঈনুল আহসান। *গল্পসমগ্র* ১। দিব্যপ্রকাশ, ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৩৮।
১৬. তদেব, পৃ. ৩১।
১৭. তদেব, পৃ. ২৭।
১৮. তদেব, পৃ. ৮১।